উত্তর। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন—বাংলা তথা ভারতে ইংরাজ শাসন চালু হওয়ার প্রথম যুগে ইংরাজ শাসকবর্গ ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও ধর্ম ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি পালন করে। বিপদের সম্ভাবনা দেখে তারা দেশীয় রাজনীতি ছাড়া কোন ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি। তথাপি পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে ভারতীয় সমাজে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশীয় সমাজ, সংস্কৃতিতে ও ধর্মে নবযুগের সূত্রপাত হতে থাকে। পশ্চিমের যুক্তিবাদী সংস্কৃতির প্রভাব এদেশের বিভিন্ন দিগন্তে নতুনত্ব এনে দেয়। ফলে ভারতীয়রা তাদের প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে সূক্ষ্ম চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। এই অনুসন্ধিৎসার ফলে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, কৃষ্টির জগতে নতুন চেতনার সৃষ্টি হতে থাকে। এই নব চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার তাগিদে ধর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের দাবী ওঠে। এই নয়া ধর্মীয় দাবী মেটানোর জন্য ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা-সমাজ, আর্য-সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন-এর নেতৃত্বে ব্যাপক ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয়।

ব্রাহ্ম সমাজ—পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টান পাদ্রী কর্তৃক হিন্দুধর্মের নিন্দা ও ব্যঙ্গ স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে তার আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যাড়ম্বর বর্জন করে তাকে বেদান্ত ও উপনিষদের ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁর লক্ষ্য ছিল বহু দেবদেবীর স্থানে একেশ্বরবাদী ও কুসংস্কারমুক্ত এক ধর্মমতের প্রচলন করা। তিনি হিন্দুধর্মকে সার্বজনীনত্ব দান করতেই চেয়েছিলেন, তাঁর ধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক কিছু ছিল না। হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য তাঁর আন্দোলন থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি হয়। বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে এক নিরাকার উপাসনা রীতি প্রচারের জন্যই এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। এই ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রাহ্ম সভা পরবর্তীকালে নব্য বুদ্ধিজীবীদের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের জন্য একটি উপাসনা গৃহ নির্মাণ করা হয়। এখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ও মূর্তি পূজার বিরোধী যে কোন লোকেরই প্রবেশের অধিকার ছিল। ব্রাহ্ম সমাজ কোন নতুন ধর্ম ছিল না; রামমোহন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত উপবীত ধারণ করেন এবং ধর্মে ছিলেন হিন্দু-ব্রাহ্মণ।

রামমোহনের মৃত্যুর পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় সংগঠনে পরিণত করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিতরা তাকেই পবিত্র হিন্দুধর্ম বলে গ্রহণ করে। এ সময়ে ব্রাহ্ম সমাজ খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণের প্রচেষ্টাকে প্রবলভাবে

ব্যাহত করতে সক্ষম হয়। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে পুনরায় জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। এইভাবে রামমোহনের ধর্ম আন্দোলন ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতাকে নব রূপদানে সক্ষম হয়। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে এবং বহু-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয়। কিন্তু কেশবচন্দ্রের যুক্তিনিষ্ঠা দেবেন্দ্রনাথ পছন্দ না করায় কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করে তাঁর 'ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেন। তাঁরই প্রভাবে 'প্রার্থনা সমাজ' নামে একটি সংগঠন মহারাষ্ট্রে গড়ে ওঠে। মাদ্রাজেও একটি বেদ-সমাজ স্থাপিত হয়। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয় যখন কোচবিহারের রাজ পরিবারে তিনি তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ দেন। তাঁর সহকর্মীরা তার কাছ থেকে সরে গিয়ে "সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ" স্থাপন করেন। এর পরিচালক হন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি। এইভাবে ব্রাহ্ম-সমাজ তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ব্রাহ্ম ধর্মমত শেষ হয়ে যায়। দেশের বৃহত্তর মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র প্রস্তুত করতে না পারায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটে। তবে বিভিন্ন পর্যায়ে তা সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বহু কল্যাণমুখী কর্মসূচী পালনে সমর্থ হয়েছিল। স্ত্রী-শিক্ষা, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ, বাল্য-বিবাহ বর্জন প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। হিন্দু সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করার কাজে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গণ্ডীভুক্ত থাকলেও এর প্রগতিবাদী চিন্তাধারাকে সত্যই অস্বীকার করা যাবে না।

প্রার্থনা সমাজ—সংস্কারের আন্দোলন পশ্চিম ভারতেও দৃষ্ট হয়। মারাঠী ভাষায় সর্বপ্রথম হিন্দু রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান 'লোকহিতবাদী' নামে পরিচিত গোপালহরি দেশমুখ। দেশমুখ ধর্মীয় সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক নির্ভীক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসমণ্ডলীও অনুরূপ ধর্ম সংস্কারে সচেষ্ট হয় বোম্বাই শহরে। তাঁদের সদস্যবৃন্দ মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালান।

তবে হিন্দুধর্ম সংস্কারের বৃহত্তম আন্দোলন পশ্চিম ভারতে দেখা দেয় 'প্রার্থনা সমাজ' নামে পরিচিত সংস্থার নেতৃত্বে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত মনীষী ডঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ। ডঃ আত্মারাম মধ্যযুগের ধর্মবীর, নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। পরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ নেতা কেশবচন্দ্রের প্রভাবে পরে 'প্রার্থনা সমাজ' স্থাপন করে জাতিভেদ দূরীকরণ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতির প্রচার শুরু করেন। সমাজের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের স্বার্থেও ডঃ আত্মারাম সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণপুরুষ। এঁদের চেষ্টায় বোম্বাইয়ে 'বিধবা বিবাহ সমিতি,' 'দক্ষিণ ভারতীয় শিক্ষা সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা সমাজের বৃহত্তর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে, মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গঠনের জন্য এবং প্রথাগত গোঁড়ামি ত্যাগ করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালান। রাণাডের মানবধর্মী ছিল সর্বজনবিদিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় মণ্ডিত। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য ধর্ম, একেশ্বরবাদ প্রভৃতি অপেক্ষা সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেই অধিক আগ্রহ দেখায়। ধর্মকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার লক্ষ্যও অবশ্য তাঁদের ছিল।

আর্য সমাজ—হিন্দুধর্ম সংস্কারের আর এক পথিকৃত ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। এই লক্ষ্য

পূরণের জন্য তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আর্য সমাজ নামে এমন এক সংস্থা গড়ে তোলেন যার মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রায় ছিল না। এর ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ রাজা রামমোহনের ন্যায় একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ধর্মকে পুনঃ প্রবর্তন করা। জাতিভেদ প্রথা, বাল্য বিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধেও তিনি অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যান। তাঁর একটি পদ্ধতি ছিল 'শুদ্ধি' আন্দোলনের দ্বারা ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ও অহিন্দুদের পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা। এই পথে তিনি ভারতবর্ষে একধর্ম, একজাতি প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন। দয়ানন্দের আবেদন ছিল ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে। এদের সমর্থন ছাড়া ভারতে যে কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠবে না তা তিনি স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেন। তবে স্বামী দয়ানন্দের আর্য সমাজ ছিল হিন্দুধর্ম সর্বস্ব—এটি ছিল সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট। তাই সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা ছিল অন্তরায়। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভবিষ্যত ভারতের বহু বিপ্লবীই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার পূর্বাহ্নে আর্য সমাজের আদর্শে পুষ্ট হয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন—উনবিংশ শতকের শেষভাগে মহাপুরুষ রামকৃষ্ণদেব ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার সমন্বয় ঘটাতে সচেষ্ট হন। সকল ধর্মের প্রতি রামকৃষ্ণদেবের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর মতবাদের প্রধান বক্তব্যই ছিল যে ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ একটি নয়—'যত মত তত পথ'। এইভাবে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের সূচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ধর্মচিন্তা তাঁর তিরোধানের পরেই শিষ্যবর্গের প্রচেষ্টায় চরম অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের পন্থা হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই রামকৃষ্ণের বাণী সারা ভারতে প্রচার করেন। সমগ্র বিশ্বে রামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের কাজে স্বামীজী নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনিই রামকৃষ্ণের মানবতাবাদীতাকে ধর্মরূপে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলেন। ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর ও সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করতে তিনি আহ্বান জানান। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও বেদান্ত ধর্মমতকে প্রচারের জন্য তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। মিশনটির অন্যতম লক্ষ্য হল ধর্ম ও সমাজের কুসংস্কার দূরীভূত করা এবং মানবধর্মের চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি, সমাজসেবা ও জনগণের নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের মধ্যে ও বাইরে অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি করেছে। সমাজের দুর্গত ও বিপর্যস্ত জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

উনবিংশ শতকের উল্লিখিত ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনগুলি শুধু হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্যই পরিচালিত হয়েছিল তা নয়। ভারতের বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে ব্যবধানগুলি দূরীভূত করে জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যের মহান আদর্শ প্রচারেও সাহায্য করেছিল।